বিগ ব্যাংগ কেন ব্ল্যাকহোহ হয়নি?

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

অনেক বেশি পরিমাণ ভর বা শক্তিকে এক জায়গায় জড় করলে ব্ল্যাকহোল পাওয়া যায়। তাহলে বিগ ব্যাংগ কেন ব্ল্যাকহোল হয়ে যায়নি? তখন তো মহাবিশ্বের সব ভর-শক্তি একটি বিন্দুতে জড় হয়েছিল? বর্তমান মহাবিশ্ব নক্ষত্র, ছায়াপথে ভর্তি। কিন্তু মহাবিশ্বের শুরুতে এগুলো একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। তখনি কেন এসব পদার্থ ব্ল্যাকহোল হয়নি?

ছবি ১

*মহাবিশ্ব অনেক বড়। কিন্তু তবু একে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখেছি আমরা। তুবও আছে নানা সীমাবদ্ধতা। আমাদের পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও পরিমাপ নিখুঁত নয়। মহাবিশ্বের অনেক দূর থেকে আসা সংকেত আমরা পেয়ে যাই। আদি মহাবিশ্বের উত্তপ্ত, ঘন, সুষম ও দ্রুত প্রসারিত হতে থাকা অবস্থার কথা আমরা বুঝতে পারি। এরই নাম উত্তপ্ত বিগ ব্যাংগ। কিন্তু আমাদের হাতে ধরা পড়া সবচেয়ে আদিম সংকেত দিয়েও আমরা বিগ ব্যাংয়ের সময়টা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি না।*

একইভাবে আমরা ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত পর্যন্ত দেখতে পারি। বাইরে থেকে এর ভেতরের কিছু দেখতে পারি না। কথাটা ব্র্যাক হোলটা ব্ল্যাক হোল হয়ে যাওয়ার পরে যেমন সত্য, তেমন সত্য আগেও। অথচ না দেখেও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, ব্ল্যাতহোলের অস্তিত্ব বাস্তব। শুধু কি তাই? জানি ব্ল্যাকহোলের ভর এবং অবস্থানও।

চিত্র ২

*ছবিটা বিখ্যাত হয় ইন্টারস্টেলার মুভির মাধ্যমে। ছবিতে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে বর্ধন চাকতি (accretion disk)। ব্ল্যাকহোলের প্রভাবে আশেপাশের অঞ্চল চরমভাবে বেঁকে আছে। ঘটনা দিগন্তের খুব কাছে ও দূরে সময়ের প্রবাহ একদম আলাদা। দূরের অঞ্চলে মূল মহাকর্ষ অনেক দুর্বল। সময় তাই চলে অপেক্ষাকৃত অনেকটা দ্রুতবেগে।*

আমরা যতটা মনে করি, ব্ল্যাকহোলের ধারণার জন্ম আসলে তারও অনেক আগে। ১৮শ শতকে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন মিচেল প্রথম ধারণাটি প্রস্তাব করেন। তাঁর ভাবনাটা ছিল এ রকম: আপনি সূর্যের মতো একটি বস্তু নিলেন। জানেন এর ভর ও আয়তন জানা আছে। এবার এরই বড় একটি সংস্করণ বানালেন। বড় করলেন ভর ও আয়তন দুটোই। তবে ঘন্তত্ব থাকল একই। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, বস্তুটা থেকে বের হয়ে আসতে প্রয়োজনীয় মুক্তিবেগ আলোর বেগের চেয়েও বেশি হবে।

ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ভাবুন। পৃথিবী থেকে একটি বস্তুকে উপরে ছুঁড়ে মারলে এটি পৃথিবীতে ফিরে আসে। আরও জোরে ছুঁড়ে মারলে আরেকটু পরে ফিরে আসবে। বেগের সাথে সাথে বেড়ে যাবে উপরের অবস্থানকাল। একটি নির্দিষ্ট বেগে মারতে পারলে আর আসবেই না। হারিয়ে যাবে মহাশূন্যে। এ নির্দিষ্ট বেগটাই মুক্তিবেগ। এভাবেই রকেট ছোঁড়া হয়। এখন, মিচেলের ভাবনা ছিল, নক্ষত্রের ভর ও আয়তন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছলে তার মুক্তিবেগ হবে আলোর বেগেরে চেয়ে বেশি। ফলে বাইরের দুনিয়া থেকে বস্তুটাকে দেখা যাবে না। এখান থেকে বের হতে পারবে না কোনো আলো। অন্য কোনো সংকেত বা কণাও পারবে না। ভেতরে ঘটা সব ঘটনা ভেতরেই চাপা থাকবে।

তবে আলোর কণাতত্ত্ব-নির্ভর এ ধারণা হারিয়ে যায় তরঙ্গতত্ত্বের প্রভাবে। ১০০ বছর পরের কথা। আইনস্টাইন মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করলেন স্থান-কালের বক্রতা হিসেবে। সার্বিক আপেক্ষিকতা নামের এ তত্ত্বই মহাকর্ষের সবচেয়ে আধৃুনিক নমুনা। ব্ল্যাকহোল এবার নতুন করে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

চিত্র ৩

*শোয়ার্জশিল্ড ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের ভেতরে বা বাইরে স্থানের চলাচল দেখে চলন্ত ওয়াকওয়ে বা জলপ্রপাতের মতো মনে হবে। তবে ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে ভেতরে গেলে আলোর বেগে ছুটলেও (বা সাঁতার কাটলে) আর নিস্তার নেই। স্থান-কালের অনন্ত টান আপনাকে আছড়ে নিয়ে ফেলবে সিংগুলারিটির বিন্দুতে। ঘটনা দিগন্তের বাইরে অবশ্য অন্য বল মহাকর্ষকে হারিয়ে দিতে পারে। বিদ্যুৎচৌম্বকের মতো বল এখানে ভেতরের দিকে পতনশীল বস্তুকেও উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে।*

আইনস্টাইন বললেন, ব্যাপারটা এমন নয় যে বস্তুর ভর আছে আর একটি ভর আরেকটি ভরকে অদৃশ্য বলের আকর্ষণে বাঁধে। মহাকর্ষের ধারণা নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের জিনিস। বাস্তব পর্যবেক্ষণে পাওয়া বহু জিনিস তার ব্যাখ্যার অতীত। নিউটনের মহাকর্ষ বলতে পারে না, মহাকর্ষ আলোকে কীভাবে বাঁকায়, জানে না, কেন গ্রহের কক্ষপথ ব্যতিক্রমী আচরণ করে। জানে না মহাকর্ষ তরঙ্গের কথা।

আইনস্টাইন নিয়ে এলেন বৈপ্লবিক ধারণা। বস্তু ও শক্তি পাল্টে দেয় স্থান-কালের বক্রতা। স্থান-কালের বিবর্তন নির্রভর করে এ বক্রতার ওপর। আর বক্রতাই বস্তু ও শক্তিকে চলার পথ বাতলে দেয়।

ধরুন মহাবিশ্বে একটি বিন্দুভর আছে। যেটি তৈরি করে শোয়ার্জশিল্ট স্থান-কাল। যে স্থান-কাল অঘূর্ণনশীল ব্ল্যাকহোল তৈরি করে। যেকোনো ভারী কণাকে এ স্থান-কালে নিয়ে গেলে তা ব্ল্যাকহোলটির তৈরি করা স্থান-কালের বক্রতা অনুভব করবে। কণাটির অবস্থান ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্তের বাইরে হলে সেটি ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় টান এড়িযে চলতে পারবে। তবে সেজন্য তার বেগ হতে হবে প্রচণ্ড। তবে কণাটির অবস্থান ঘটনাদিগন্তের ভেতরে হলে কখনোই আর সেটি ফিরে আসতে পারবে না। চলে যাবে কেন্দ্রীয় বিন্দুর দিকে। যার নাম সিংগুলারিটি। এটা ঘটতে লাগবে সসীম ও নির্দিষ্ট একটি সময়। সহজেই সময়টা হিসাব করাও যায়।

চিত্র ৪

*ধরুন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে না। তাহলে একে স্থির বস্তু দিয়ে যেকোনো ধরনের বিন্যাসে ভর্তি করা যাবে। কিন্তু এর শেষ পরিণতি হবে ব্ল্যাকহোল। আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে এমন মহাবিশ্ব অস্থিতিশীল। স্থিতিশীল হতে হলে একে প্রসারিত হতে হবে। আর না হয় মেনে নিতে হবে এর অনিবার্য পরিণতি।*

সার্বিক আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাকহোল নিয়ে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক হলো ব্ল্যাকহোল তৈরি হওয়া খুব সহজ। তাত্ত্বিকভাবে এর স্মভাবনা বাদ দেওয়াও খুব কঠিন কাজ। আইনস্টাইনের গবেষণার একদম শুরুতে পাওয়া ফলাফল চিত্রে দেখা যাচ্ছে। এটা পাওয়া যাবে মহাবিশ্ব:

* সমতল, স্থির ও অপরিবর্তনশীল স্থান-কাল দিয়ে গড়া হলে
* এতে এক গুচ্ছ স্থির ও চাপমুক্ত (ধুলিকণা) ভর রাখা হলে
* সে ভর বা কণাগুলোকে বিবর্তিত হতে দিলে
* তখন এদের সবাই মহাকর্ষ অনুভব করবে
* অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হবে একটি অঘূর্ণনশীল ব্ল্যাকহোল, ঘটনা দিগন্ত ও সবকিছু

যেন মনে হচ্ছে, ভরের প্রাথমিক বিন্যাস থেকে ব্ল্যাকহোলের তৈরি ঠেকাতে হলে অন্য কাউকে লাগবে। সাধারণত এ অন্য কেউ হলো বস্তুর অভ্যন্তরীণ চাপ, যা একে আরও গুটিয়ে যেতে বাধা দেবে। পরমাণুর কেন্দ্রের চারপাশ ঘিরে আছে ইলেকট্রনের মেঘ। এ মেঘের একটি চাপ আছে। নক্ষত্রে আছে আরেক ধরনের চাপ। প্রধান ক্রম দশায় নক্ষত্র নিউক্লীয় ফিউশনের মাধ্যমে জ্বলে। এ বিকিরণ বাইরের দিকে চাপ তৈরি করে অন্তস্ফোটন (তেরের দিকে গুটিয়ে যাওয়া) ঠেকিয়ে দেয়। তবে যথেষ্ট ভারী নক্ষত্র বা ভরের সমাবেশ শেষ পর্যন্ত সে চাপ উপেক্ষা করতে পারে। বিংশ শতকে রজার পেনরোজ এ ফলাফল বের করে বিখ্যাত বনে যান। তিনি দেখান, বাস্তব মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে পারে। এ গবেষণায় অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারও পান।

চিত্র ৫

*ব্ল্যাকহোলের গবেষণায় রজার পেনরোজের অনেক অবদান আছে। এর অন্যতম একটি হলো বাস্তব মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোল তৈরির তাত্ত্বিক প্রমাণ। তিনি দেখান, আমাদের মহাবিশ্বের বাস্তব কোনো বস্তু (নক্ষত্র বা ভরের অন্য কোনো সমাবেশ) ঘটনাদিগন্তের জন্ম দিতে পারে। দেখান, বস্তুটি নিজের আওতাধীন সব বস্তুকে কেন্দ্রীয় সিংগৃলারিটিতে নিয়ে জমা করবে। ঘটনাদিগন্তের একবার জন্ম হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় সিংগৃলারিটির জন্ম শুধু অনিবার্যই নয়, তাতে সময়ও লাগে সামান্য।*

কিন্তু আমরা আরও বড় প্রশ্নর মুখোমুখি। পুরো মহাবিশ্ব কি ব্ল্যাকহোল হয়ে যেতে পারে না? ধরা যাক, শুরুতে মহাবিশ্ব ছিল স্থির। মানে আর স্থান-কাল ছিল বিকাশহীন। এখন এমন মহাবিশ্বকে বিপুল পরিমাণ বস্তু, বিকিরণ বা যেকোনো শক্তি দিয়ে ভর্তি করলে এটি দ্রুত গুটিয়ে যাবে। শক্তি স্থানকে বক্র ও বিবর্তিত করে দেয়। বক্র ও বিকশিত করা মানে শুধু স্থানের কাঠামোকে বিকৃত করে চূড়া ও খাঁজ তৈরি বোঝায় না। এর অর্থ হয় স্থানকে সংকুচিত বা প্রসারিত করাও।

আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য দিক হলো একে অনেকভাবে সমাধান করা যায়। একেক সমাধানের ফল আসে একেকরকম। এক সমীকরণের একাধিক ফল আসা অবশ্য পদার্থবিদ্যায় হরহামেশাই দেখা যায়। ধরুন আপনি একটি বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়লেন। এটা কখন নেমে আসবে তা আপনি সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারবেন। তবে সে সমীকরণ সমাধান করলে একটি বিষয় আপনাকে অবাক করে দেবে। আপনি এমন কিছুও পাবেন, যা আপনি আশা করেননি। সমাধান পাবেন দুটি। এর একটি সমাধান আপনার কাঙ্খিত বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মিলে যাবে। এটা বলে দেবে, আকাশ থেকে কখন বস্তুটা মাটিতে নামবে। আর দ্বিতীয় সমাধানটি দেবে একটি অবাস্তব পরিস্থিতি। যেখানে বস্তুটিকে ছুঁড়ে মারার আগেই সেটি ভূমি ত্যাগ করবে। মানে ছুঁড়ে মারার আগেই যেন এর বেড় বেশি ছিল।

চিত্র ৬ (অ্যানিমেশন চিত্রটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন)

*মিথবাস্টারস (Mythbusters) নামের বিজ্ঞান বিনোদন অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ছোট গোলা নিক্ষেপ দেখানো হয়। ক্ষেপনাস্ত্রের বাহন থেকে একে বাহনের একই বেগে পেছন দিকে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে একে দেখে মনে হয়, স্থিরাবস্থা থেকে টুপ করে নিচে পড়ছে। বাহনের বেগ ও গোলার বেগ সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় একে অপরকে নাকচ করে দেয়। গোলাটিকে নিক্ষেপের মুহূর্ত থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে, বলটি মাটিতে পড়ার দুটি সমাধান পাওয়া যাবে। একটি ধনাত্মক সময় ও আরেকটি ঋণাত্মক। পদার্থবিজ্ঞানই কেবল বলতে পারে, কোন সমাধানটি (ধনাত্মক) বাস্তবে কাজ করবে।*

এমন কোনো গাণিতিক কৌশল নেই, যা খাটিয়ে জানা যাবে কোন সামাধানটি বাস্তব। এ সরল উদাহরণ গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। পদার্থবিজ্ঞানকে বাস্তব জগৎ খুঁজে উপযুক্ত সামাধানটি বেছে নিতে হয়। যেমন গোলার উদাহরণে আমরা খুঁজছি ধনাত্বক সময়। আর তাই বাদ দিচ্ছি ঋণাত্মক ও বাস্তবতাবিবর্জিত সমাধানটি।

একইভাবে ধরুন, আমরা মহাবিশ্বকে বিভিন্ন ধরনের শক্তি দিয়ে ভরপুর করলাম। এতে থাকল:

* সাদারণ বস্তু
* ধুলিকণা
* ডার্ক ম্যাটার
* বিকিরণ
* নিউট্রিনো
* বা ডার্ক এনার্জি বা মহাজাগতিক ধ্রুবক বা স্ফীতির সময়ের ক্ষেত্র শক্তি

দেখা যাবে, আইনস্টাইনের সমীকরণের দুটি বৈধ সমাধান আছে। এর একটি বলে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের কথা। যেখানে যেকোনো দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। আবার আরেকটিতে মহাবিশ্ব হচ্ছে সংকুচিত। বিন্দুদুটির মধ্যে দূরত্ব যেখানে কমছে। এর কোনটি আমাদের বাস্তব মহাবিশ্বের কথা বলছে? পদার্থবিজ্ঞানী এর উত্তর ‌‌দেবেন মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করে।

চিত্র ৭

১৯১২৯ সালের এডউইন হাবলের ছায়াপথের দূরত্ব ও লোহিত সরণের মূল ছবি (বাঁয়ে)। এখান থেকেই প্রসারণশীর মহাবিশ্বের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়। পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ৭০ বছর পরের আধুনিক ছবি। একটি বস্তু দূরে সরে গেলে এর আলোর রং লালের দিকে চলে আসে। এক বলে রেড শিফট বা লোহিত সরণ। লোহিত সরণ পরিমাপ করে বস্তুর দূরত্ব ও দূরে সরে যাওয়ার গতি বের করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। ব্যবহার করা হয় বেশ কিছু বিশেষ ধরনের বস্তুও। ছবিতে একদম কাছের মহাবিশ্ব (নীচে বাঁয়ে) দূরের মহাকাশ পর্যন্ত (ওপরে ডানে) দেখা যাচ্ছে। এই পুরো পরিসরেই দূরত্ব ও দূরে সরার সম্পর্ক একই রকম থাকে। হাবল গ্রাফের আরও প্রাথমিক সংস্করণ বানিয়েছিলেন জর্জ ল্যমেট্র (১৯২৭) ও হাওয়ার্ড রবার্টসন (১৯২৮)। ব্যবহার করেছিলেন হাবলের উপাত্তই।

১৯২০-এর দশকের শেষের দিকের সময় থেকেই (প্রায় ১০০ বছর আগে) মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারে নিশ্চিত করে জানা গেছে। মানে সমীকরণের এ সমাধানটাই বাস্তব মহাবিশ্বের কথা বলে। এছাড়া মহাবিশ্বের অতীতকালীন সময়ের প্রসারণ হারও বের করা যায়। সময়ের সাথে সাথে কীভাবে বদলেছে সে হার তাও তাই জানা যায়। আর সে হার দারুণভাবে মিলে যায় আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে পাওয়া প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে। বর্তমান মহাবিশ্বে আছে:

* ৬৮ ভাগ ডার্ক এনার্জি
* ২৭ ভাগ ডার্ক ম্যাটার
* ৪.৯ ভাগ সাধারণ বস্তু
* ০.১ ভাগ নিউট্রিনো
* প্রায় ০.০১ ভাগ ফোটন ও
* নগণ্য পরিমাণ অন্য জিনিস

অতীতে মহাবিশ্ব আরও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। সময়ের সাথে সাথে কমছে প্রসারণের হার। শেষ পর্যন্ত এ হার বর্তমান হারের ৮০-৮৫ ভাগে পৌঁছবে।

তাহলে অতীতে যেতে যেতে একম মাহবিশ্বের জন্মের শুরুতে পৌঁছে গেলে কী দেখা যাবে? উত্তপ্ত বিগ ব্যাং বা মহাজাগতিক স্ফীতির সময়ে চলে গেলেও দেখা যাবে, প্রসারণ চলছিল। সেসময় মহাবিশ্বের সব শক্তি স্থান নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছিল। আলাদা বস্তু বা শক্তি আকারে নয়। এ শক্তি তখন ছিল স্ফীতিমান ক্ষেত্র শক্তি আকারে। কিন্তু প্রসারণ তখনও অবিরাম চলছিল। সেই ১৩৮০ কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের জন্মের মুহূর্তেও চলছিল প্রসারণ।

চিত্র ৮

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতিগুলো। অতীতের বিভিন্ন নমুনার মধ্যে পার্থক্যটা খেয়াল করুন। শুধু ডার্ক এনার্জিময় মহাবিশ্বের চিত্র পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে যায়। ১৯১৭ সালেই ডি সিটার ডার্ক এনার্জি অন্তর্ভুক্ত করে সমাধান পেশ করেন। মহাবিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ দুটোই খুব সহজেই অনুমান করা যায়। এর জন্য শুধু জানতে হবে বর্তমানের প্রসারণ হার উপস্থিত বস্তুর পরিমাণ।

আর উত্তরটা লুকিয়ে আছে এখানেই। মহাবিশ্ব বর্তমানে প্রসারিত হচ্ছে। আর প্রসারণ হার ক্রমশ কমছে। অতএব অতীতে মহাবিশ্ব ছিল আরও বেশি উত্তপ্ত। আরও ঘন, সুষম এবং ছোট আকারের। আরেকটি বিষয়ও আছে। যদিও ব্যাপারটা সাধারণত আমরা এড়িয়ে যাই। সুদূর অতীতে প্রসারণ হারও ছিল অত্যধিক। সেটা হোক বিগ ব্যাংয়ের মহহূর্তটিতে বা তারও আগে, যখন ঘটেছিল স্ফীতি। (অবশ্য শক্তিশালী মত অনুসারে বিগ ব্যাং দিয়েই ঘটেছিল মহাবিশ্বের স্থান-কালের সূচনা। স্ফীতি ঘটেছিল পরে। তবে চিরন্তন স্ফীতি (eternal inflation) তত্ত্ব বা কিছু কোয়ান্টাম কসমোলজি নমুনায় স্ফীতের পরে বিগ ব্যাং ঘটে।)

মহাবিশ্ব সম্পর্কে এই তথ্যটা না জানলে আমরা প্রশ্নটার জবাব পাওয়ার জন্য যথেষ্ট তথ্যের অভাব থাকত। তখন বরং মহাবিশ্বের শক্তি ও বস্তুর সাথে স্থান-কালের বক্রতা ও বিবর্তনের সম্পর্ক অনেকরকম হতে পারত।

* মহাবিশ্বের জন্ম হতে পারত সঙ্কোচনের মাধ্যমে। ফলে এর ভেতরের সব শক্তি ও বস্তু অন্তস্ফোটিত হয়ে ছোট্ট বিন্দু হয়ে যেত। ফলাফল হত মহাসঙ্কোচন (big crunch) বা ব্ল্যাকহোল।
* মহাবিশ্ব স্থিরাবস্থা থেকে শুরু হতে পারত। তাতেও সব বস্তু ও শক্তি অন্তস্ফোটিত হত। ফলাফল আগের মতোই মহাসঙ্কোচন বা ব্ল্যাকহোল।
* শুরু হতে পারত প্রসারণ দিয়ে। তবে বস্তু ও শক্তি একে আবার গুটিয়েও ফেলতে পারত। অথবা চিরন্তন প্রসারণ চলত। আবার দুই দিকের টানাটানি সমান ভারসাম্যে থাকলে কোনোটাই হত না। চিরপ্রসারণও নয় আবার অন্সফোটনও নয়।

চিত্র ৯

মহাবিশ্বের বস্তুর ঘনত্ব আর খানিকটা বেশি হলে (লাল দাগ) এটি হত আবদ্ধ মহাবিশ্ব। প্রসারণ শুরু হলেও আবার তৎক্ষনাৎ গুটিয়ে যেত। ঘনত্ব আরেকটু বেশি হলে (ঋণাত্মক বক্রতা) প্রসারিত হত আরও দ্রুত। আকারও বত আরও বড়। তবে বাস্তবতা কোনোটার পক্ষেই বলছে না। মহাবিশ্বকে দেখে ভারসাম্যে আছে বলে মনে হচ্ছে। মোট শক্তি ঘনত্ব ও প্রাথমিক প্রসারণ হার কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। সেটার কারণটা বিগ ব্যাং নিজে বলতে পারছে না। ফলে সার্বিক মহাবিশ্বে বক্রতা অনুপস্থিত। আবার মহাবিশ্ব পুরোপুরি সমতলও নয়। যেসব স্থানীয় এলাকায় ঘনত্ব অতিমাত্রায় বেশি, সেখানে হয়তো মহাবিশ্বের সার্বিক প্রসারণ হার মেনে নেয় (যেমন আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথ ও অ্যান্ড্রোমিডা একে অপর থেকে দূরে না সরে কাছে আসছে।)

আমাদের চোখে দেখা পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। মহাবিশ্ব গুটিয়ে যায়নি। ঘটেনি মহাসঙ্কোচন। অতএব মহাবিশ্বের প্রাথমিক সঙ্কোচন বা প্রাথমিক স্থিরাবস্থা আমরা বাতিল করে দিতে পারি। আসলে আমরা স্ফীতির ধারণাটাই পেয়েছি তৃতীয় সম্ভাবনা থেকে। আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন দুটি বিষয়কে ভারসাম্যে আনা খুবই কঠিন। বিষয় দুটি হলো

* উত্তপ্ত বিগ ব্যাংয়ের শুরুতে প্রসারণের প্রাথমিক হার
* সেই প্রাথমিক সময়ের সব ধরনের শক্তি ঘনত্বের যোগফল

এ যেন আমরা এক মহাজাগতিক লটারি করছি। যেখানে বিশাল সূর্য থেকে ছোট্ট এক অতিপারমাণবিক কণা বেছে নিলাম আমরা।

একেই আমরা বলি পদার্থবিদ্যার ফাইন-টিউনিং সমস্যা। কথাটার শাব্দিক মানে হলো কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম সমন্বয়। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে শব্দটা ব্যবহার করে বোঝানো হয়, বহু ধ্রুবক ও সূত্রের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সঠিক সম্ভাবনার মাধ্যমে ঠিকঠিকভাবে তৈরি হতে পেরেছে। সম্ভাবনা ছিল অসীমসংখ্যক। সব পরিণতির ছিল সমান সম্ভাবনা। এর মাঝেও মহাবিশ্ব প্রায় অসম্ভাব্য এক পরিণতি বরণ করেছে। বিগ ব্যাংয়ের আগে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। জানার চেষ্টা করা হয়, ঠিক কোন উপায়ে উপরের দুটি বিষয় নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। দেখা যায়, প্রসারণকে প্রভাবিত করা স্থানের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রাথমিক অবস্থাই ভারসাম্য তৈরি করে দিয়েছিল।

চিত্র ১০

সূচকীয় প্রসারণ (বিস্তারিত statmania)। এ প্রসারণ ঘটেছিল মহাজাগতিক স্ফীতির সময়। এ স্ফীতি শক্তিশালী, কারণ এটি চলে অবিরাম। স্থানের নির্দিষ্ট কোনো একটি অঞ্চল চতুর্দিকে প্রায় ১০^-৩৫ সেকেন্ডে দ্বিগুণ আকার হয়ে যায়। ফলে কোনো কণা বা বিকিরণ পাতলা হয়ে যায়। যেকোনো বক্রতা সমতল স্থানের মতো হয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকবার দ্বিগুণ হওয়ার পরেই (১০^-৩২) ছোট বিন্দু আকারের মহাবিশ্বের আকার হয়ে যায় বর্তমান পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের চেয়ে বড়। অথচ সেই বিন্দুটা প্ল্যাঙ্ক স্কেলের চেয়ে ছোট (প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ছোট জিনিসের তুলনায় পরিমাপটি কাজে লাগে। এর মান ১০^-৩৫ মিটার।)

হ্যাঁ, আমরা জানি, বস্তুর উপস্থিতি স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। আর বস্তু চলে সে বক্র পথ ধরে। তবে স্থান ঠিক কীভাবে বাঁকে সে সম্পর্কে আমরা মাঝেমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার ভুলে যাই। স্থান বাঁকতে পারে দুইভাবেই–প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়ে। মহাবিশ্বের সূচনার পরেই এটি আবার ঞ্জ্জের ওপর অন্তস্ফোটিত (গুটিয়ে সঙ্কুচিত) হয়নি একটি কারণেই। আর সেটি হলো, প্রাথমিক প্রসারণ হার ও বস্তু ও শক্তির ঘনত্ব দারুণ ভারসাম্যে (ফাইন-টিউনড) ছিল। সে প্রসারণ নিশ্চয়ই উত্তপ্ত বিগ ব্যাংয়ের সাথে মহাবিশ্বের শুরুতে এ বৈশিষ্ট্যটা না থাকলে শুরুতেই মহাবিশ্ব বিন্দুতে আপতিত হত।

স্থান-কালের ভাগ্যে কী আছে তা শুধু এতে উপস্থিত বস্তু ও শক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। সে সময় পর্যন্ত মহাবিশ্বের আগের অবস্থাও তাতে ভূমিকা রাখে। ধরুন আমরা বর্তমান সময়ে কোনোভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণ আটকে দিলাম। বাকিসব বৈশিষ্ট্য রাখলাম আগের মতোই। তখন কিন্তু মহাবিশ্বের ভবিষ্যত বর্তমানের মতো নিশ্চিত থাকবে না। বড় কাঠামোয় এটি প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হতে পারে। তার কোনটি ঘটবে তা জেনেই কেবল আমরা এর ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারি।

আশার বাণী হলো, আমাদের মহাবিশ্ব সকল অবস্থায় সবসময় এ নিয়মগুলো মেনে চলেছে। ফলে এর বর্তমান অবস্থা দেখেই আমরা এর দূর অতীত বুঝতে পারি। বুঝতে পারি দূর ভবিষ্যতও। তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে দেখলে মহাবিশ্বের শুধু একটি গল্পই পাওয়া যায়।

সূত্র: বিগ থিংক ডট কম

https://bigthink.com/starts-with-a-bang/big-bang-become-black-hole/